মাও বনাম গান্ধীঃ প্রতিবাদি আন্দোলনের ভবিষ্যত কোন দিকে?

-বিপ্লব পাল ১২/১৪/২০০৮

মানব বিবর্তনের পথেই রাষ্ট্রের জন্ম। জন্মলগ্ন থেকেই রাষ্ট্রের একটি চরিত্র অপরিবর্তিত। সেটি ক্ষমতার মোহ এবং নিজস্বার্থ রক্ষার্থে শাসক কুলের দমন এবং নিপীড়ন। জীববিজ্ঞানীরা এব্যাপারে মানবকুলের সাথে পশুকুলের অনেক সাদৃশ্য পেতেই পারেন। শাসক শ্রেণীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে শোষিতদের প্রতিবাদ মানব ইতিহাসের সব থেকে গুরুত্বপূর্ন অধ্যায়। সবকটি ধর্মের উৎপত্তিই একেক ধরনের প্রতিবাদি আন্দোলন। রোমান সম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ইতিহাসে আমরা দেখি গল, গথ,ইজিপ্টিশিয়ানদের ধারাবাহিক বিদ্রোহ। ভারতে মুঘল সম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মারাঠা, রাজপুত এবং বাঙালীরা বারবার গর্জে উঠেছে-শেষে এদের বিদ্রোহে মুঘল সম্রাজ্যের পতন সম্পূর্ন। ইতিহাসের সেই ধারা একবিংশ শতাব্দিতেও অবিচ্ছিন্ন। গোটা বিশ্বজুরে যত প্রতিবাদি আন্দোলন এখন চলছে-তার মূলত তিনটি ধারাঃ

(১) নাগরিক এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্যে অহিংস আন্দোলন। তিব্বতের স্বাধীনতা আন্দোলন, বার্মার গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং আমেরিকার সিভিল রাইট মুভমেন্ট এই ঘরানার। গান্ধীবাদি রাজনৈতিক আদর্শই এদের চেতনা।

(২) শোষনমুক্তির জন্য সহিংস কমিনিউস্ট আন্দোলন-ভারত, নেপাল, বাংলাদেশের মাওবাদি চেতনার মূল লক্ষ্য। ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকাতেও মাওবাদি গেরিলাদের প্রভাব বেড়েই চলেছে।

(৩) এছারা ধর্ম ভিত্তিক প্রতিবাদি আন্দোলন প্রায় অনেক দেশেই দেখা যায়। ধর্ম যে সব সময় শাসক শ্রেনীর হাত শক্ত করে তা নয়। যেমন সৌদি আরবে রাজতন্ত্র বা পাকিস্থানের শাসক শ্রেনীর বিরুদ্ধে জিহাদিরাই লড়ছে। তামিল টাইগারও একধরনের হিন্দু প্রতিবাদি আন্দোলনে বিশ্বাসী। তবে এই ধরনের আন্দোলন একটি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে আরেকটি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির লড়াই। সেই জন্যেই শাহর ইরাণের বিরুদ্ধে ইসলামের প্রতিবাদি আন্দোলন আসলেই ক্ষমতার কুশীলবদের প্রতিস্থাপিত করে-শোষন এবং অত্যাচার নতুন জমানাতে বরং আরো বেড়ে ওঠে। এই যে হামাস ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে লড়াই করছে-কিন্ত এদের অন্তিম লক্ষ্য কি? মেয়েদের বোরখা পড়িয়ে ঘরে ঢুকিয়ে সভ্যতার ঘড়িকে উলটো দিকে চালানো।

এখানেই মাও এবং গান্ধীবাদি প্রতিবাদি আন্দোলনের সাথে অন্যদের পার্থক্য। শোষকদের ক্ষমতাচ্যুত করলেই শোষন শেষ হয় না। নতুন শাসক শ্রেনী, যারা এক সময় প্রতিবাদি আন্দোলনের শরিক ছিল-তারাই নব্যশোষক শ্রেণীর স্থান নিয়ে থাকে। পশ্চিম বঙ্গে এটা আমরা দেখেছি। বামফ্রন্ট এসেছিল গ্রামের ক্ষমতাসীন জমিদার শ্রেণীটিকে হটিয়ে। কিন্ত যারা এই পুরাতন ক্ষমতার কেন্দ্রগুলিকে হঠালো, তারাই আজ গ্রামে গ্রামে অত্যাচারের নব্য বুলডোজার।

এই জন্যে মাওবাদি এবং গান্ধীবাদি প্রতিবাদি আন্দোলন কোন দেশকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। তাদের দৃষ্টিতে প্রতিবাদি আন্দোলন ই আন্দোলনের শেষ কথা না। প্রতিবাদি আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে মানুষের চরিত্রের বিবর্তন এবং তার থেকে সমাজবিবর্তনের মধ্যে দিয়েই শোষনমুক্ত সাম্যবাদি সমাজের উত্তরোনই ফাইনাল ডেস্টিনেশন। তবে দুটি ধারার মত, পথ এবং আদর্শ ১৮০ ডিগ্রী আলাদা।

সহিংস বনাম অহিংসঃ

মাও বিশ্বাস করতেন প্রতিবাদি আন্দোলন কখনোই অহিংস বা গণতান্ত্রিক হতে পারে না। তার চোখে গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ আসলেই শোষক শ্রেনীর বিরুদ্ধে খেটে খাওয়া মানুষদের ক্ষোভকে "ম্যানেজ করার বুর্জোয়া পদ্ধতি। শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামই শ্রেনী সংগ্রামের সর্বোচ্চ ধাপ। এটাই মাওবাদি পথ।

Revolutions and revolutionary wars are inevitable in class society, and without them it is impossible to accomplish any leap in social development and to overthrow the reactionary ruling classes and therefore impossible for the people to win political power.
"On Contradiction" (August1937), Selected Works, Vol. I, p. 344.*

War is the highest form of struggle for resolving contradictions, when they have developed to a certain stage, between classes, nations, states, or political groups, and it has existed ever since the emergence of private property and of classes.
"Problems of Strategy in China's Revolutionary War" (December 1936), Selected Works, Vol. I, p. 180.

অন্যদিকে মহত্মা গান্ধী সব ধরনের যুদ্ধ এবং সহিংসতাকে "ম্যানস্লটার" বা "মানবনিধন যজ্ঞ" বলে মনে করতেন। হিংসাত্মক পদ্ধতিতে

হিংসাত্মক স্বাধীনতা বা মুক্তি আসে-এটাই ছিল তার বক্তব্য।

“Violent means will give violent freedom. That would be a menace to the world and to India herself.!”

গান্ধী এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন ইতিহাস বিশ্লেষন করে। নভেম্বর রিভল্যুশন বা লং মার্চের ফলে রাশিয়া বা চীনে যে "মুক্তি" এল- তার বলি কোটি কোটি মানুষ। স্টালিনের জমনাতেই তিন দশক ধরে রাষ্ট্রের হাতে খুন হয়েছে প্রায় চারকোটি লোক। চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবে প্রাণ দিয়েছে আরো পাঁচ কোটি। সশস্ত্র বিপ্লব দিয়ে বাংলাদেশ মুক্ত হল '৭১ সালে। কিন্তু '৭৫ সালের মধ্যেই আরো রক্তপাতে প্রতিবিপ্লব ঘটিয়ে মুক্তি যুদ্ধের চেতনার দফারফা করে দেওয়া হল। '৭১ এর আগের সেই একই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিটা বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় ফিরে এল।

প্রশ্ন উঠবে বাংলাদেশ যদি গান্ধীবাদি অহিংস আন্দোলনের ফলে স্বাধীন হত-তাহলে কি এমন হত? এক্ষেত্রে প্রথম প্রশ্ন উঠবে খান সেনাদের বিরুদ্ধে আর কি গান্ধী চলে? ওসব সভ্য বৃটিশদের বিরুদ্ধে ঠিক আছে। অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তির কথা প্রায় কেওই মানতে চাইবেন না। পাকিস্থানের বর্বরতার বিরুদ্ধে এসব খাটত না বলেই সবাই মনে করবেন। কিন্তু ধরুন, যদি বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন অহিংস পথে থাকত-তাহলে মুক্তিযোদ্ধা তথা মুক্তিকামী বাংলাদেশীদের মনে "স্বাধীনতার চেতনা" আরো দৃঢ় বদ্ধমূল হত। হাতে বন্দুক উঠলে, হিংসার পথে মানব মুক্তির চেতনাগুলো দুর্বল হয়-এটা গান্ধীবাদের অন্যতম মুলমন্ত্র। আহিংস আন্দোলনে প্রতিবাদের একমাত্র ভরসা প্রতিবাদির দৃপ্ত চেতনা-কারন তার হাতে বন্দুক নেই। সেই জন্যেই দেখুন ১৯৭৫ সালের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের একটা শ্রেনীই স্বাধীনতার চেতনার বিরুদ্ধে গিয়ে স্রেফ ক্ষমতার লোভের জন্যে স্বাধীনতার বিরুদ্ধে থাকা শক্তিটির সাথে হাত মিলিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হত্যা করল। অর্থাৎ ওই শ্রেনীর মুক্তিযোদ্ধারা স্বাধীনতার যুদ্ধের স্পিরিটকে মোটেও গ্রহণ করে নি-তাদের কাছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধটা ছিল পাঞ্জাবের শাসককুল থেকে বাংলার শাসককুলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের খেলা। এটা অহিংস আন্দোলনে সম্ভব না। কারন ক্ষমতাদর্পী নররুপী বাঘ সিংহদের বিরুদ্ধে খালি হাতে দাঁড়াতে যে বুকের পাটা লাগে, তা একমাত্র মানুষের ক্ষমতালোভি চরিত্রের বিরুদ্ধে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমেই তৈরী হয়।

এই জন্যেই গান্ধীবাদি আন্দোলন একিই সাথে রাষ্ট্রে, সমাজ এবং আত্মোন্নতির পথ-প্রতিবাদি আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে প্রতিবাদির চরিত্রের সর্বোত্তম বিকাশই এখানে শেষ কথা।

সশস্ত্র প্রতিরোধ ইতিহাসে নতুন কিছু নয় সেটা আগেই লিখেছি। গান্ধীবাদি পথও আসলেই প্রাচীন ভারতে জৈন এবং বৌদ্ধদের প্রতিবাদি আন্দোলনের নব্যরূপ। তবে অনেকেই গান্ধীবাদি আন্দোলনকে হিন্দুধর্মের সাথে জড়িয়ে দেন। সেটা মারাত্মক ভুল। গান্ধীবাদি এবং হিন্দুত্বের পথ ১৮০ ডিগ্রী আলাদা। যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রতিবাদি আন্দোলনের ব্যাপারে কৃষ্ণের গীতার বাণীর সাথে মাওএর অনেক মিল আছে। গীতার ধর্মযুদ্ধের মতন মাও সমস্ত যুদ্ধকে ন্যায় এবং অন্যায় যুদ্ধ এই দুই ভাগে ভাঙতেন।

“History shows that wars are divided into two kinds, just and unjust. All wars that are progressive are just, and all wars that impede progress are unjust. We Communists oppose all unjust wars that impede progress, but we do not oppose progressive, just wars. Not only do we Communists not oppose just wars; we actively participate in them. As for unjust wars, World War I is an instance in which both sides fought for imperialist interests; therefore, the Communists of the whole world firmly opposed that war. The way to oppose a war of this kind is to do everything possible to prevent it before it breaks out and, once it breaks out, to oppose war with war, to oppose unjust war with just war, whenever possible.
Ibid., p. 150.

শোষনমুক্তির জন্যে মানুষকে আক্রমন করার এই যুক্তি গান্ধী মানেন নি। তার মতে লড়াইটা সিস্টেমের বিরুদ্ধে, মানুষের বিরুদ্ধে নয়-কারন সৃষ্টির লীলাখেলায় সব মানুষই সমান। অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত দুজনেই মানুষ। কেও শোষন করলে, অত্যাচার করলে, না বুঝে ভুল করে করছে। শাসকদের সেই ভুল ভাঙাতে হবে। শাসকদের আত্মোপলদ্ধির মধ্যে দিয়েই শোষনের অবসান হবে- এটাই ছিল তার মত।

“It is quite proper to resist and attack a system, but to resist and attack its author is tantamount to resisting and attacking oneself, for we are all tarred with the same brush, and are children of one and the same Creator, and as such the divine powers within us are infinite. To slight a single human being, is to slight those divine powers and thus to harm not only that Being, but with Him, the whole world.”
-Gandhi

অর্থাৎ গান্ধীর সাথে মাওবাদের মূল পার্থক্য ভাববাদ বনাম বস্তুবাদের। গান্ধীর চোখে সবাই ঈশ্বরের সন্তান। শোষকের শোষন যেমন ঈশ্বর বিরুদ্ধ -ঠিক তেমনই শোষকের বিরুদ্ধে যুদ্ধও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। মানুষের সাথে মানুষের যুদ্ধই ঐশ্বরিক চেতনা বিরোধি। তাই তার চোখে আসল ভিলেন হচ্ছে সিস্টেম-যে সিস্টেমে মানুষ ক্ষমতা এবং ধণদর্পে অত্যাচার করে, শোষন করে। ক্ষমতা এবং শোষন মানুষের আধ্যাত্মিক বিচ্যুতি-তাই গান্ধীবাদের লড়াইটা সেই আধ্যাত্মিক বিচ্যুতির বিরুদ্ধে-এবং সেই সিস্টেমের বিরুদ্ধে যা

এইসব মানবিক বিচ্যুতি ঘটাচ্ছে। তাই প্রতিবাদি আন্দোলনের মাধ্যমে শোষক এবং অত্যাচারীর মনের পরিবর্তন ঘটিয়ে শোষন এবং অত্যাচারের অবসান ঘটানোই গান্ধীবাদ। ঈশ্বরে জায়গায় মানবিকতা ঢোকালেও তার মূল বক্তব্য একই থাকে।

গান্ধীর এই মডেল সম্পূর্ন মার্ক্সীয় বস্তুবাদ বিরোধি। কারন মার্ক্সীয় বস্তুবাদে সিস্টেম থেকে মানুষকে আলাদা করা যায় না। মার্ক্সীয় দৃষ্টিতে মানব মন তার পারিপার্শিক বস্তুবাদি সিস্টেমের প্রতিফলন।

আসল ব্যাপারটা হচ্ছে মানুষের মনের ব্যাপারে ১০০% মার্ক্সীয় বস্তুবাদি বা ১০০% গান্ধীবাদি ভাববাদি মডেল দুটিই ভুল। বিবর্তন মনোবিজ্ঞান থেকে আমরা জানি মানুষের মনের চিন্তার অনেকটাই জেনেটিক্যালি কোডেড-শুধু বস্তুবাদি কণ্ডিশনিং করে মানব মন তৈরী হয় না। মানুষের ক্ষমতার লোভ বিবর্তন প্রসুত এবং তা মানুষের যৌনতার আরেকটি প্রতিফলন। আলট্রুইজমও বিবর্তনের ধারায় সমাজের "রিপ্রোডাক্টিভ ফিটনেস" যা স্বার্থপর জীনের "ক্ষমতালোভ" এর বিরুদ্ধে কাজ করে যুদ্ধের পরিমান কম রাখে-যাতে অজথা প্রানশক্তির ক্ষয় না হয়। অর্থাৎ বিবর্তনের মধ্যেই ক্ষমতার লোভ বনাম গান্ধীবাদি আলট্রুইজমের ধারা সব সময় থেকে গেছে। গান্ধীবাদি চেতনা পশুকুল থেকে মানবকুলে সব সময় ছিল-এবং গ্রুপ সারভাইভালের সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা টেকনিক। সেটাকেই ঈশ্বরের নামে বাপুজি আরো ভাল ভাবে নিজের জীবনের মাধ্যমে দেখিয়েছেন। এবং এই নিয়ে গত দুই দশক বিস্তর গবেষনা হয়েছে।

সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ Erik Erikson's মনোবিজ্ঞানের ওপর লেখা গবেষনা Gandhi's Truth: On the Origins of Militant Nonviolence। এরিকসন এই গ্রন্থে নেকড়ে এবং হরিনদের মধ্যে চালু কয়েকটি খেলার উল্লেখ করেছেন। নেকড়েরা অনেক সময় যুদ্ধ যুদ্ধ খেলে এবং একগ্রুপ অন্যদের হারালেও, বিজিতদের মেরে ফেলে না-অত্যাচারও করে না-বরং তাদের "ক্ষমা" প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে দুটি গ্রুপের মধ্যে বন্ধুত্ব আরো দৃঢ় হয়। প্রশ্ন হচ্ছে এই একটা গ্রুপ-অন্যের প্রতি আলট্রুইস্ট ব্যাবহার দেখাবে কি না সেটা নির্ভর করছে, যে গ্রুপটি বিরোধিতা করছে-তারা বিরোধি পক্ষকে "অন্য পক্ষের লোক" বা "অন্যস্পেসিস" বলে ধরে নিচ্ছে কিনা। যেমন পশ্চিম বঙ্গে মাওবাদিরা এখন সিপিএমের লোকেদের দেখলেই খুন করে। উভয়েই বাঙালী এবং ভারতীয়-কিন্ত ঘৃণাটা এমন জায়গায় গেছে, মাওবাদিরা সিপিএমের লোকজনকে স্বগোত্রীয় বা মানুষ বলেই মানতে চাইছে না। অন্যদিকে মিশনারীরা গোটা পৃথিবীর লোককেই নিজেদের গ্রুপের লোক বলে মানে। গান্ধীর পথ ছিল সেটাই। যাতে জাত, ধর্ম, দেশের নামে অযথা গ্রুপিজম বন্ধ হয়। অবশ্য গান্ধিজী মনে করতেন, তার দর্শন জীববিজ্ঞান বিরোধি-কিন্ত এখন আমরা জানি সেটা ঠিক না। গান্ধীজি সম্ভবত পশুকুলের আলট্রুইস্ট ব্যাবহারের সাথে পরিচিত ছিলেন না।

The law of the survival of the fittest is the law for the evolution of the brute, but the law of self-sacrifice is the law of evolution for the man.... The basis of self-sacrifice is love.... It is no non-violence if
we love merely those that love us. It is non-violence only when we love those that hate us।

বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে আমি মাওবাদি বা গান্ধীবাদী-কোনটার ই ভবিশ্যত আছে বলে মনে করি না। মাওবাদের ভিত্তি-শ্রেণী বৈষম্য এবং শ্রেণী দ্বন্দ, তা গণতন্ত্র এবং প্রযুক্তির আরো বিকাশের সাথে সাথে লুপ্ত হবে। কারন ভবিষ্যতে অটোমেশনের জমানায়, নীচুশ্রেনীর কাজগুলি রোবটরাই করে দেবে। ফলে শ্রেনীর ধারনাটাই লোপ পাবে। অন্যদিকে গান্ধীবাদের মূল ভিত্তি-মানুষে মানুষে বিভেদ, বাজার অর্থনীতি এবং ইন্টারনেট বিস্ফোরনের ফলে ভেঙে যাবে। ভবিষ্যতের মানুষের শুধু দুটি পরিচয় থাকবে-ক্রেতা আর বিক্রেতা। বাঙালী, ভারতীয়, আমেরিকান, হিন্দু, মুসলমান-এই সবপরিচয় বাজার অর্থনীতি এবং তথ্য বিস্ফোরনে ক্রমশ অর্থহীন হচ্ছে। সেটা আমরা চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। তবুও গান্ধীবাদের ভিত্তি বিবর্তনের সাথে জড়িয়ে আছে বলে, আত্মবিশ্লেষন এবং ক্ষমতার অনাচারের বিরুদ্ধে তা শ্বাস্বত পথ।

সমস্যা হচ্ছে আমাদের দেশের মাওবাদিদের নিয়ে। ভারতে এই মুহূর্তে প্রায় ১৫,০০০ মাওবাদি গেরিলা। পশ্চিম বঙ্গে প্রতিদিন মাওবাদি বনাম সিপিএমের লড়াই এ লাশ স্তুপীকৃত হচ্ছে। যদিও মাওবাদিরা শোষিতদের পক্ষেই লড়াই করছে-আমি মনে করি তাদের পথ সম্পূর্ন ভুল এবং ব্যার্থ হতে বাধ্য। গণতন্ত্রের মাধ্যমে গরীবদের ক্ষমতায়নের জন্যেই তাদের লড়াই করা উচিত। এতে সময় বেশী লাগবে কিন্তু অনর্থক রক্তপাত আটকাবে। উন্নয়ন ও থেমে থাকবে না।

আমি ব্যাক্তিগত ভাবে সব সময় মনে করি লড়াইটা হওয়া উচিত সিস্টেমের বিরুদ্ধে, ঘৃণার বিরুদ্ধে, ভুল আদর্শের বিরুদ্ধে। মানুষের বিরুদ্ধে নয়। অনেকেই ইসলামিস্ট বা ফ্যানাটিক মুসলমানদের বিরুদ্ধে তীব্রঘৃণা ছড়ান। এটা ভুল পথ। তারাও মানুষ। ভুল আদর্শবাদের ফাঁদে পড়ে তারা আমাদের ঘৃণা করতে শিখেছে। তার জন্যে কি আমরা তাদের পালটা ঘৃণা করবো? তাতে কি ঘৃণা কমবে? বরং উলটো হবে। তাতে ঘৃণা আরো বাড়বে। বরং আমি মনে করি তাদের ফ্যানাটক আদর্শের সমালোচনার সাথে সাথে আমাদের ভালোবাসাটাও তাদের প্রাপ্য। নইলে আমরা তাদের থেকে কিসের জন্য উন্নততর? গান্ধীজির এটাই সবথেকে শক্তিশালী অস্ত্র। যারা গ্রুপিজম করে, তারা অন্যগ্রুপের চেয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠতর ভাবে। আঘাতটা সেই শ্রেষ্ঠতার ধারনায় দাও। বৃটীশদের বিরুদ্ধে সেটাই ছিল গান্ধীজির আমোঘ অস্ত্র-যা স্থান কাল নির্বিশেষে খুবই কার্যকরী।